বেজায় মজার গল্প

তপনকুমার দাস

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

সেই যখন ছোটো ছিলাম, তখন ভাবতাম – কতদিন, আর কতদিন পরে বাবার মতো বড়ো হব। কিং ক্যানিউট হয়ে সবাইকে শাসন করব আঙুল তুলে। দুষ্টুমি করলে কেউ বকুনি দেবে না, কান মলে দেবে না, দুড়দাড় দু'চার ঘা কিল বসাবে না। ভাবতে ভাবতেই একদিন বড়ো হয়ে গেলাম। বাবা, জেঠা, মামা হয়ে গেলাম। কিন্তু হায়! ভেবেছিলাম বড়ো হলে ভারি মজা হবে। হল উল্টো। বড়ো হয়ে দুঃখই বেড়ে গেল। একটুও দুষ্টুমি করতে পারিনা, ডাংগুলি খেলতে পারিনা। ঘুড়ি ওড়াতে দেয় না কেউ। ঘরের মেঝেয় ফুটবল খেলে চুরমার ভাঙতে পারিনা ড্রেসিং টেবিলের কাচ। বড়ো হয়ে এখন তাই ভাবি, আহা! একবার যদি ছোট্টটি হতে পারতাম! কিন্তু হায়, উপায় যে নেই। আর উপায় নেই বলেই সোনার খাঁচার সেই ফেলে আসা শৈশব-কৈশোরের দিনগুলোর স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করি। মজার স্মৃতি হলে বেজায় হেসে উঠি, দুঃখ-কষ্টের স্মৃতি হলে মন ভার হয়ে যায়।

পুরোনো সেই সব দিনগুলোর স্মৃতি হাতড়াতে হাতড়াতে আর বর্তমান দিনের মজার সব ঘটনা দেখতে দেখতে লিখে ফেলতে চেষ্টা করি দু'একটা গল্প। এমনিই লিখতে লিখতে জমা হয়ে যায় কয়েকটা গল্প, আর সেই সব গল্পগুলো মলাটের মোড়কে হয়ে যায় বই। নিজের জন্যে লিখতে গিয়ে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে সবার মধ্যে। ফিরে ফিরে পেতে ইচ্ছে করে শৈশব আর কৈশোরের দিনগুলো।

ছোটো বড়ো সবাই, সব বয়সেই মানুষ হাসি আনন্দ মজা হুল্লোড়ে বেঁচে থাকতে ভালোবাসে। কারণ জীবনের সংগ্রাম এবং সমস্যা এত গভীর যে হই হুল্লোড় হাসি আনন্দ মজায় মজায় ভেসে থাকার সময়ই পাওয়া যায় না। তারই অবসরে আমাদের সকলকে খুঁজে নিতে হয় মজা আনন্দ হাসি হুল্লোড়। এগুলোই তো সমস্যাদীর্ণ জীবনে বেঁচে থাকার অক্সিজেন। প্রেরণা। 'বেজায় মজার গল্প' বইটিতে তেমনিই প্রেরণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা ছোটোরা বড়োরা সবাই তো মজায় মজায় মজে থাকতে চাই, ভালোবাসি। আর সেই কারণেই লেখকের সৃষ্টিতে প্রেরণা জোগান প্রকাশক। বই ছাপা হয়ে পৌঁছে দেন পাঠকের হাতে।

সন্দীপ নায়ক তাঁদের অন্যতম, যাঁরা ছোটোদের জন্যে ভাবেন, বড়োদের জন্যে ভাবেন, জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিতদের জন্যেও ভাবেন। মজার গল্প ছাপার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ দেখেছি সবকিছু ছাপিয়ে যায়। 'বেজায় মজার গল্প' ছাপার জন্যে, তাঁকে ধন্যবাদ না দিলে অন্যায় করা হবে। 'পুনশ্চ' পরিবারের সদস্যরা যে বেজায় উৎসাহ দিয়েছেন সে কথাও স্বীকার করতে হয় আন্তরিকতায়। এই প্রসঙ্গে আরএকজনের কথা চুপি চুপি একটু আলাদা করে না বললে শান্তি পাব না। সে রোমিও দে। বর্ণবিন্যাস থেকে শুরু করে প্রকাশনার শেষ ধাপ পর্যন্ত 'বেজায়

মজার গল্প' তার হাত ধরেই উঠে এসেছে। তাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই ইন্দ্রনীল ঘোষকে –প্রচ্ছদ ও অলংকরণে বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য। সুসাহিত্যিক ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী চরম ব্যস্ততার মধ্যেও আমার আবোল তাবোল লেখা পড়েন ও উৎসাহিত করেন। 'বেজায় মজার গল্প' তাঁকে উৎসর্গ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

তপনকুমার দাস

বইমেলা, ২০০৭

সূচিপত্র

নিমন্ত্রণ লজ	১১
গতি অগতি	১৮
মনের জোর	২৮
ভোটের বারোটা	৩৬
প্রিভেনশন	৪৬
আকাশবাড়ি	৫৭
টোটকা মানে ওষুধ নয়	৬৬
কালু পালের মেস	৭৫
রামরাজাতলা	৮৪
এসো বসো আহারে	৯৫
হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা	১০৬
বাগনানের বাগানবাড়ি	১১৭
ইধর কা গাড়ি	১২৮
আমি কি ডরাই কভু	১৩৯
থার্মোকলের বাক্স	১৪৮
পুজো করাবেন — পুজো ?	১৫৭
লাইফ অন হুইল	১৬৬

নিমন্ত্রণ লজ

অফিসের কাজে হোটেল কিংবা গেস্ট হাউসে রাত্রিবাস এই প্রথম নয়। শুধু কি হোটেল বা গেস্ট হাউস? স্টেশনের রিটায়ারিং রুম থেকে শুরু করে ধর্মশালা, চাকরি জীবনের অর্ধেক রাতই কেটেছে এইসব নানান হট্ট-মন্দিরে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, অসমের জেলায়-জেলায় প্রায় সব হোটেল ধর্মশালা গেস্ট হাউসের খবর চোখ বুজে বলে দিতে পারে সায়ন্তন। কোন হোটেলে কটা বেড, কোন ধর্মশালার ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কে, কোন গেস্ট হাউসে জলের অভাব, কোথায় নোংরা বেড শিট— সব খবর তার নখ-দর্পণে।

ঘোরাঘুরির চাকরিতে অভিজ্ঞতাও কম হয়নি সায়ন্তনের। চাকরির বাইরেও চোখ খুলে দেখা এবং জানার ইচ্ছায় বাইরের জগৎটাকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। উপভোগ করেছে নতুন সব জায়গার বিচিত্র সব সংস্কৃতি, লোকাচার, চালচলন, ব্যবহার, আচার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস।

অথচ এমন ঘটনা কোনওদিন ঘটেনি।

আটটা চল্লিশের ট্রেন লেট করে স্টেশনে পৌঁছেছিল রাত বারোটা পঞ্চাশে। রবিবারের মাঝরাতে সায়ন্তনকে নিয়ে স্টেশনে নেমেছিল সাকুল্যে পাঁচজন রেলযাত্রী। সাইকেল স্ট্যান্ড থেকে দুজন পাড়ি দিয়েছিল সাইকেলে। বাকি দুজন মোটরবাইকে। ব্যাগ কাঁধে স্টেশনের ভিতর ফিরে গিয়ে রিটায়ারিং রুম কিংবা নিদেনপক্ষে ওয়েটিং রুমে রাত কাটাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। সঙ্গে রিকশা।

কোথায় যাবেন বাবু?

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠেছিল সায়ন্তন। মানুষ তো নয়— চামড়ায় মোড়া এক চলন্ত কঙ্কাল। চুলহীন, টাকমাথা ছাপিয়ে ঠিকরে আসছে কপাল। কপালের নীচে চোখের খাদ ছাড়াতে-না- ছাড়াতেই চোয়াড়ে চোয়াল। চোয়ালের সামনে কালচে বাদামি বত্রিশ পাটি দাঁত। আর সারা মুখের চামড়া ঢাকা সাদা-কালো খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে। সঙ্গের রিকশাটাও একই ধাঁচের। যেন পাল্লা দিয়ে তৈরি। মেড ফর ইচ আদার।

রিকশা আর রিকশাচালককে দেখে জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমেও শরীরে একঝলক ঠান্ডা কাঁপুনির ঢেউ বয়ে গেছিল সায়ন্তনের। মাঝরাতে মানুষের বদলে কোনও অতিমানুষ নয় তো? ভূত প্রেত কিংবা অন্য কিছু? ভূত প্রেতে অবশ্য সায়ন্তনের ভয় নেই। কারণ বিশ্বাস নেই। ছোটোবেলায় ঠাকুমা আর বড়ো হয়ে এর-এর মুখে ভূতের গল্প শুনেছে বটে— কিন্তু বিশ্বাস করেনি। এখনও করে না। ভূতের গল্পকে বরং ভয়ের রূপকথার গল্প বলেই

মনে হয় সায়ন্তনের। পক্ষীরাজ ঘোড়া, আলাদিনের প্রদীপ, তেপান্তরের মাঠে পরির দেশ যেমন কেউ ওকে দেখাতে পারেনি, তেমনি ভূতও দেখেনি কোনওদিন। কত অমাবস্যার রাতে একা-একা নিঝুম রাস্তা পার হয়েছে। বিশাল-বিশাল হোটেল, ধর্মশালার ঘরে একা-একা লোডশেডিং-এর রাত কাটিয়েছে। কবরখানা শ্মশানের চৌহদ্দি দু-পায়ে মাড়িয়ে গেছে। ভূতের সন্ধান কখনও পায়নি।

তবুও স্টেশন চত্বরের বাইরে মানুষটাকে দেখে সত্যিই চমকে উঠেছিল সায়ন্তন। মানুষটার মুখের ওপর থেকে নিজের নজরের ফোকাস ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক দেখেও

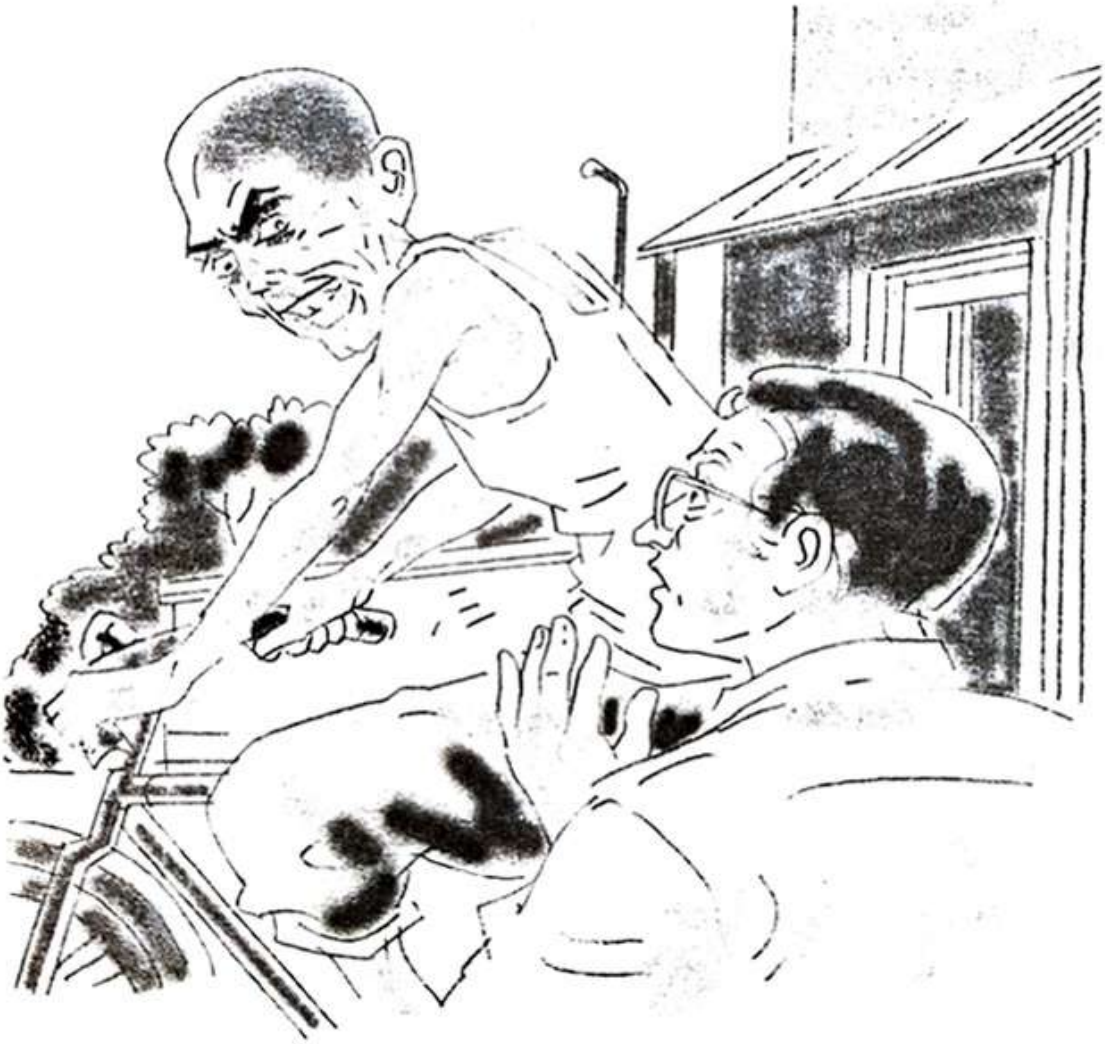

নিয়েছিল এক ঝলক। না, অন্ধকারের লেশমাত্র কোথাও নেই। টাওয়ার লাইটের আলোয় বরং দিনের চেয়েও বেশি ফরসায় উদ্ভাসিত স্টেশন এলাকা। আলোর জমানা থাকলে কি আর ভূত থাকতে পারে? পারে না। ঠাকুমাই বলেছিলেন, আলো আর রাম। ভূতের দুই যম।

— কই বাবু! যাবেন তো চলেন। খামোখা রাত ভোর করে মশার কামড় খান কেন?

— ওঃ! হ্যাঁ চলুন। দ্বিতীয়বার মানুষটা ডাক দিতেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো রিকশায় চেপে বসেছিল সায়ন্তন।

— সদরপাড়ায় নে যাব তো?

— হ্যাঁ। কিন্তু আপনি জানলেন কেমন করে? অবাক সায়ন্তনের গলা শুকিয়ে কাঠ।

— জানি, জানি আমাদের সবকিছুই জানতি হয়। ওসুদের ফিরিওয়ালারা সব সদরপাড়াতে ওঠে। যারা ছোনো পাউডার ফিরি করতে আসে তারা ওঠে উকিলপাড়ায়। ইনসিওরের দালালরা যায় বিধেনপল্লীতে।

— আমি যে ওষুধ ফিরি করতে এসেছি, বুঝলেন কীভাবে? মানুষটার চেহারা, রাস্তার নির্জনতা আর দূরে-দূরে টিমটিমে জ্বলা ল্যাম্পপোস্টের বাতির আলো-আঁধারিতে সত্যি-সত্যিই যেন একটা ভূতুড়ে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

এই পথেতে চাকা তো আর কমদিন টানছি নে— অদ্ভুত শব্দ করে হেসে উঠেছিল মানুষটা, ব্যাগপত্তরের বহর দেখে ঠাহর করে নিই।

— ওঃ! কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ বসে রাস্তার ঝাঁকুনি উপভোগ করে মনটাকে সহজ করার চেষ্টা করেছিল সায়ন্তন।

আমি রে আমি! গোল করিস নে—রাস্তার একপাল কুকুর মাঝরাতে হঠাৎ রিকশায় সওয়ার যাত্রী দেখে চিৎকার করে উঠতেই নিজের পরিচয় ঘোষণা করেছিল মানুষটা। সঙ্গে-সঙ্গে ঘেউ-ঘেউ হুঙ্কার হাওয়ায় মিশিয়ে আনন্দের কুই-কুই সুরে যেন গান গেয়ে উঠেছিল কুকুরগুলো। আর ঠিক তখনই নতুন করে মনের ওপর চাপ পড়েছিল সায়ন্তনের। কে মানুষটা? রিকশাওয়ালা তো?

ধুস! ভূত আবার কী? ভূত মানে তো অতীত। স্মৃতি। সুখের স্মৃতি। দুঃখের স্মৃতি। আনন্দের হাসিকান্না হইহুল্লোড়ের স্মৃতি। ভূত ভাবলেই ভয়ের ছক্কায় আউট হয়ে যাওয়া। ধুস! ধুস! সকাল হতে না হতেই চষে ফেলতে হবে শহরটা। নতুন এলাকায় প্রমোট করতে হবে কোম্পানিকে। সিনিয়র কলিগদের কাছে সদরপাড়ার নাম শুনেছিল, মানুষটাও নিয়ে যেতে চাইল সদরপাড়ায়। কিন্তু কত দূরে সে পাড়া?

— তিন মিনিট। বাঁয়ে গোরস্থানের গলি পার হলেই হাসপাতাল মোড়।

গোরস্থানের গলি?— নিজের অজান্তেই মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়, কোনো সদর রাস্তা নেই?

গোরস্থানের গলি মানে কি আপনাকে গোরস্থানে নে যাব? ভয় নেই। গোরস্থানের নাগালটাও পাবেন না। সে আরও মাইলটাক ভেতরে।

— না, না ভয় পাব কেন? আসলে বলছিলাম কি গোরস্থান মানেই তো সাপখোপ, শকুন পেঁচা, কুকুর শেয়াল....

ভূত-পেত্নী শাকচুন্নী ব্রেহ্মদৈত্যি! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।— সায়ন্তনের তালিকার সঙ্গে নিজের তালিকা যোগ করে হো-হো হাসিতে রাতের অন্ধকার আকাশ-বাতাস ফাটিয়েছিল মানুষটা। তারপর বলেছিল, আমি তো গোরস্থানেই থাকি।

ন্যান! নামেন, নেমন্তন্ন বাড়ি এসে গেছি— রিকশা থামিয়েই হাঁক-ডাক— পানু, এ্যাই পানু! ওঠ শিগগির। ফিরিওয়ালা বাবু এয়েচেন। ঘর দে!

'ফিরিওয়ালা বাবু' শব্দ দুটোর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল সায়ন্তনের। কিন্তু 'নেমন্তন্ন বাড়ি'— বুঝতে সময় লেগেছিল। জিজ্ঞাসা করতেও ভরসা পায়নি, কারণ মানসিক অবস্থা ছিল না। তবে ধাতস্থ হওয়ার পর আবিষ্কার করতে দেরি হয়নি। আসলে হোটেলের নাম 'নিমন্ত্রণ লজ'। বাঃ, বেশ খাসা নাম। মনে-মনে খুশি হয়েছিল সায়ন্তন। এতদিনের ঘোরাঘুরির চাকরিতে সে উপলব্ধি করতে পেরেছে হোটেল বা লজের নামের মধ্যেও একটা আর্ট আছে।

— ফ্যামিলি নেই তো? মানুষটার ডাকে ঘুমভাঙা চোখ ডলতে-ডলতে তালাবন্ধ কোলাপসিবল গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল পানু।

অন্ধ! কানা কুথাকার!— বলতে-বলতে নিজের হাতে সায়ন্তনের ব্যাগপত্তর নামিয়ে চামড়াঢাকা কঙ্কাল হাতের তালু মেলে ধরেছিল সামনে, দ্যান আমার ভাড়াটা দিয়ে দ্যান।

— কত?

— যা খুশি। বিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ!

— অ্যাঁ!

পঞ্চাশ টাকাই দেওয়া উচিত স্যার। ভূতের রিকশায় চড়ে এলেন। ভাগ্যি ভালো তাই নিরাপদে পৌঁছে গেছেন।— পানু বলেছিল।

ভূত ছাড়া এত রাতে কোন মানুষের রিকশা রাস্তায় চলে শুনি?— পানুর কথায় একটুও অসন্তুষ্ট না হয়ে দাঁতকপাটি মেলে হাসি ছড়িয়েছিল মানুষটা। তারপর সায়ন্তনের দেওয়া পঞ্চাশ টাকার নোটটা 'নিমন্ত্রণ লজে'র হোর্ডিং-এর আলোয় মেলে ধরে বলেছিল, জানেন বাবু, মানুষের উপকার করতে নেই। মাছি-তাড়ানো হোটেলে রাত দুকুরে খদ্দের নে এলাম তার কোনো দাম নেই?

— দাম তো হাতে-হাতে পেয়েই গেলে! দশটাকা ভাড়ার বদলে একলাফে পঞ্চাশ! আসেন স্যার! আসেন।— লজের বারান্দায় রাখা টেবিলের ড্রয়ার খুলে মেলে ধরেছিল খাতা। লিখে ফেলেন নাম, ঠিকানা, পেশা—

নিজের নাম লিখতে-লিখতে ধাতস্থ হয়ে উঠেছিল সায়ন্তন।

— রাতচরা! বুঝলেন স্যার, রাত চরা!

— কে?

— ওই আমাদের মহাদেব কাকা। যার কৈলাস রথে চেপে এখানে এলেন স্যার।

— কিন্তু তুমি যে বললে...

— ভূত, তাই তো? কাকার ভালো নাম মহাদেব, মহাদেব দলুই। মহাদেব মানে শিব। আর শিব তো ভূতপ্রেতদেরও প্রভু। মহাদেবের আর একনাম ভূতনাথ। তাছাড়া...

— তাছাড়া?

— সারাটা দিন টিকিটিও খুঁজে পাবেন না কাকার। সন্ধে নামলেই 'কৈলাস রথ' নিয়ে হাজির হয়ে যাবে স্ট্যান্ডে। সারারাত 'কৈলাস রথ' নিয়ে চষে বেড়ায় শহরে-শহরে, গ্রামের অলিতেগলিতে। রাতচরা মানুষ কিনা তাই লোকে মহাদেব নামটাই বদলে দিয়েছে।

— ওঃ!

'কৈলাস রথ'-এর ব্যাপারটা বোধহয় এখনও খোলসা করে বুঝতে পারেননি, তাই না স্যার? দোতলায় দুশো এক নম্বর ঘরের তালা খুলতে-খুলতে রহস্য-ঢাকা হাসি ছড়িয়েছিল পানু। সায়ন্তনের জবাবের অপেক্ষা না করে শুনিয়ে দিয়েছিল 'কৈলাস রথ'-এর গল্পটাও, মহাদেবের বাড়ি কোথায়? কৈলাসে! অনেক-অনেক দূরে উঁচু বরফ ঢাকা পাহাড়ে। সেখানে তো গাড়িঘোড়া যায় না। যায় শুধু রথ। মহাদেব কাকার রিকশার নাম তাই স্যার 'কৈলাস রথ'।

— ঠিকই বলেছ! পদ্মলোচন না হলে কি আর কানা ছেলের নাম মানায়? পানুর সঙ্গে নিজের খুশি যোগ করতে-করতে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছিল সায়ন্তন।

আপনি রেস্ট ন্যান স্যার— আবার একগাল হাসি ছড়িয়ে বিদায় নিয়েছিল পানু। তার উঠতি বয়সের ধুপধাপ পায়ের সিঁড়ি ভাঙার শব্দ শুনতে-শুনতে দরজায় খিল দিয়েছিল সায়ন্তন। খুশি হয়েছিল মহাদেব কিংবা ভূতনাথের ওপর। শুধুমাত্র নামেই নয়, রুচিবোধ আছে 'নিমন্ত্রণ লজ'-এর মালিকের। দুধ-সাদা পরিপাটি বিছানা, তকতকে আসবাবপত্তর। হালকা রঙের দেওয়াল। দেওয়াল ফুঁড়ে রুম স্প্রে-র মিহি গন্ধ। জ্যৈষ্ঠের গরম ছাপিয়ে ঘরের ভিতর শরতের হিমেল পরশ। ছোটো-ছোটো জেলা শহরে এমন হোটেল খুব কমই পাওয়া যায়।

সন্ধে নাগাদ ট্রেনে ঝালমুড়ি খেয়েছিল সায়ন্তন। সুতরাং খিদেয় পেট চনমন করে উঠলেও এত রাতে নিমন্ত্রণ লজে আর যাই হোক খাওয়ার নিমন্ত্রণ কেউই করবে না। অতএব পাখা চালিয়ে নিজেকে বিছানায় মেলে দিয়েছিল সায়ন্তন। বাঁ-হাতের কবজিতে বাঁধা ঘড়ির ওপর নজর ছড়িয়ে পড়ে নিয়েছিল সময়— দুটো কুড়ি।

ঘুম আসার আগের আচ্ছন্নতা। আধখোলা, আধবোজা চোখের পরদায় সারাদিনের ছায়াছবি দেখার ফাঁকেই সায়ন্তনের চোখে ভেসে উঠেছিল ঘরের জানালার কপাটে সাঁটা কাগজের লেখাটা— উত্তরের জানালা খুলবেন না। লালচে মলিন সাদা কাগজের পিঠে কালো স্কেচপেনে অপটু হাতের লেখা। সত্যিই তো! এতক্ষণ নজরে পড়েনি। সারাঘরে তো একটাই জানালা। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম নেই কোথাও। তবুও এই সাবধান-বাণী কেন? চোখ জুড়ে নেমে আসা ঘুমের আবেশে অবশ হতে-হতে সে রহস্যের জট খোলা দূরে থাক— নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সায়ন্তন।